চল্লিশের দশক (১৯৪০-১৯৪৯) : বাংলা ছোটগল্পের সন্ধানে

নিত্যানন্দ খাঁ

বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে বিশ শতক একটি স্বতন্ত্র স্থান জুড়ে আছে। বিশ শতক এসেছিল স্বদেশীয়ানার উত্তাপ গায়ে মেখে। এই শতকেই সাম্যবাদী চিন্তাধারা বাঙালিকে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে ছিল। সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস ধারা এই কালেই বাঙালির চোখের সামনে ফুটে উঠল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ এসে লাগল বাঙালি জীবনে। সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সারা বিশ্বব্যাপী প্রচণ্ড আলোড়ন ও ফ্যাসিজমের নগ্ন বর্বরতা সেদিন বাংলার জীবনেও নিয়ে এল পরিবর্তনের ঢেউ। বিশ শতকের চল্লিশের দশক এইসব উত্তাল আলোড়নের স্বাক্ষর বহন করে বিতর্কিত রূপ ধারণ করল বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও অর্থনীতিতে।

১৯৩৯- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

১৯৪১- জাপানী আক্রমণ।

১৯৪২- অগাস্ট আন্দোলন।

১৯৪৩- পঞ্চাশের মন্বন্তর।

১৯৪১-'৪৯- যুদ্ধের প্রয়োজনে বাংলাকে নিয়োগ।

১৯৪৬- দাঙ্গা।

১৯৪৭-'৫০- দেশ বিভাগ, স্বাধীনতা, উদবাস্তুস্রোত।

এই দশ বছরে বাঙালি নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জন্মান্তরে উত্তীর্ন হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতকে করে তুলেছিল পঙ্গু। একদিকে দেশীয় পুঁজিপতিদের শোষণ অন্যদিকে শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের দ্বিমুখী চাপের টানাপড়েনে বাংলার অর্থনীতি হয়ে পড়ল বিপর্যস্ত, মানুষের মূল্যবোধগুলির ভাঙন দেখা দিল। যৌথজীবন, পারিবারিক জীবনের সমস্ত সংজ্ঞা ভুলে গিয়ে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে স্ত্রীকে উপরওয়ালার ভোগের সামগ্রী করে তুলল, পিতা কন্যাকে বিক্রি করলেন, গৃহের নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে মানুষ পথে পথে দাঁড়ালো। সেই সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে সন্তোষ কুমার ঘোষ বলেছেন-

"..... সেইসব দুঃস্বপ্নের নিষ্প্রদীপ, পন্যমূল্যের উল্লম্ফন, মন্বন্তর, পাষাণ পথে নিরন্নের শব। দলে দলে পুরুষ, ভিখারি, দলে দলে নারীর পিছনে নিছক লোভাতুর শরির-শিকারী। অর্থনীতির আনবিক আঘাতে মধ্যবিত্ত সমাজে যৌথ বলে যা কিছু গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল, জীবনকে যদি একটা সংগ্রাম বলি, তাহলে তার নানা রণাঙ্গন জুড়ে ঘটেছিল সুন্দরের পশ্চাদপসারণ ও প্রস্থান।"

সুতরাং যুদ্ধ অনুসারী মন্বন্তর, দাঙ্গার করুণ রক্তপ্লাবী স্মৃতি, উদবাস্তুর অনিশ্চিত জীবনবোধ, সম্ভ্রমহানী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, সামাজিক পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি একের পর এক বিপর্যায়ের ধাক্কায় অশান্ত চল্লিশের দশক তাই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিক্ষুব্ধ অধ্যায় রূপেই চিহ্নিত।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে বিশাল পরিবর্তনের ঢেউ আসে। সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও সেই পরিবর্তনের তরঙ্গস্পর্শ লেগেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ার সাম্যবাদের উদ্ভব ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের পর প্রথম ক' বছর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠী পরস্পর আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ায় যুদ্ধের মোড় ফেরে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার যুদ্ধনীতি বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহলকে প্রভাবিত করে। মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর শ্রেণীসংগ্রামের বক্তব্যকে বুদ্ধিজীবীরা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের যে ধারা বয়ে চলেছিল তার প্রভাব শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনকে কখনও প্রকাশ্যে কখনও অগোচরে প্রভাবিত করেছিল।

বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গে যে কথাটি বলতে চাইছি তা হল এই- ফ্যাসিবাদী প্রশাসনের প্রত্যক্ষতা বাঙালি সাহিত্যিকদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল না। তাই ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদী গল্পের যথার্থ লক্ষভেদী চরিত্র বাংলা ছোটগল্পে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে যে সমাজে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব স্বাভাবিক-সেই অগণিত সর্বহারার দেশ এই ভারতে সাম্যবাদী আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সম্ভাব্য। সাম্যবাদী মতাদর্শ গ্রহণ সেই সময় বাঙালি বুদ্ধিজীবীর একাংশের কোনও মানসিক বাধা আসেনি। বাংলা প্রগতিশীল ছোটগল্পের ধারা চল্লিশের দশকে এই সাম্যবাদের সমর্থক লেখকদের কলমেই রূপ নিয়েছিল।

এই সাম্যবাদের লক্ষণ প্রধানত, পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী ও অফিস কারখানার মালিকের প্রতি বিরুদ্ধতা; পুলিশের অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা; উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের শ্রেণী সংরক্ষণ মানসিকতার প্রতি সমালচনা ও বিদ্রূপ; দরিদ্র মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট- তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও জীবিকার শোচনীয় অভাব এবং মাঝে মাঝে

অত্যাচারের প্রতিবাদে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত হয়া-এই বিষয়গুলির রূপায়ণে সমুজ্জ্বল।

১৯৪০-'৪১ সালে বাংলা গল্পের প্রকৃতি বদলাচ্ছে বলে মনে করেছিলেন অনেকেই। সে মনে হওয়া খুব অন্যায্য ছিল না। অন্তত লেখকদের একাংশ নতুন ধারার গল্প লিখতে আগ্রহী ও সচেষ্ট হয়েছিলেন তাতে সংশয় নেই। ১৯৪০ সাল থেকেই পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখতে শুরু করেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক। যদিও সকলেরই গল্পে এই সময়ে প্রধান হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র-কখনও কখনও মধ্যবিত্তের বিচ্যুতি ও সমালোচনা। এই সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হয় সোমেন চন্দের বিখ্যাত ছোটগল্প 'ইঁদুর' । সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'ফসল ও অন্যান্য গল্প' নামে ছ' টি গল্পের সংকলন যেখানে রূপায়িত হয়েছে কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের দ্বিধা-দুর্বলতা।

প্রগতিমনস্ক বাংলা গল্পের ধারায় পরপর কয়েকটি তীব্র অভিঘাত আসে ১৯৪১-এ জার্মানির সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র আক্রমণে, ১৯৪২-এ সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডে এবং ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে। প্রথম ঘটনায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভাব তীব্রতা পায়, দ্বিতীয় ঘটনাটি ফ্যাসিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংগঠিত করে যার প্রত্যক্ষ ফল-১৯৪২ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের প্রতিষ্ঠা। দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতা-এই দু' টি বিষয় এমনভাবে জড়িয়ে গেল বাঙালি জীবনে যে অজস্র ধারায় রচিত হতে লাগল ছোটগল্প-যেখানে অন্নহীনতা আর মানুষে মানুষে প্রীতিহিনতা ফুটে উঠেছে। যদিও সরাসরি নয়, তবু গল্পগুলির পরতে পরতে লেখা হয়ে যায় অনামাঙ্কিত এক অত্যাচারীর পীড়নের প্রতি অব্যক্ত রোষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৩) ছোটগল্পের জিগতে আবির্ভূত হন তাঁর 'খেলনা' গল্প নিয়ে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ত দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। শ্রেণী বৈষম্য তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল- 'চোর-পুলিশ' , 'খেলোয়াড়' , 'চারইয়ার' , 'মঙ্গল গ্রহ' ইত্যাদি। সোমনাথ লাহিড়ীর ১৯৪৩-এ প্রকাশিত গল্পের নামই '১৯৪৩' । এর পটভূমিতে রয়েছে নিরন্ন ও বিবস্ত্র নরনারীর হাহাকার। মূলত ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে এই ছকের প্রচুর গল্প লেখা হয়েছে। বলা বাহুল্য প্রায় প্রতিটি গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মন্বন্তরের আগ্রাসী চিত্র। কিন্তু লেখক গোষ্ঠী তথা সাহিত্যিক প্রতিবাদ সত্ত্বেও যুদ্ধজনিত সামাজিক, অর্থনৈতিক পতন রোধ করা সম্ভব হল না। মুনাফালোভী ব্যবসায়ী এবং শাসকশ্রেণীর অক্ষম শাসন ও ঔদাসীন্য বাংলার বুকে আহ্বান করল চরম

সর্বনাশকে। পঞ্চাশের মন্বন্তর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অপেক্ষা আরও করালমূর্তিতে দেখা দিল। শাসকশ্রেণী সৃষ্ট এই মন্বন্তরের জঘন্য নারকীয় উল্লাসের বলি হল লক্ষ লক্ষ মানুষ। মন্বন্তরের এই নিদারুণ ছবির বর্ণনা পাই 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায়-

"বাংলা তখন আপনাকে বাঁচাতে পারছে না। প্রাণ রাখতে গিয়ে আত্মা বিকিয়ে যাচ্ছে" ।

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এই নির্মোহ বাস্তব পটভূমিতেই সুবোধ ঘোষের(১৯১০-১৯৮০) আবির্ভাব। সুবোধ ঘোষের রচনায় সেই নির্মোহ বাস্তবদৃষ্টি লক্ষ করা যায়। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে তিনি যে সব ছোটগল্প রচনা করেন সেখানে তিনি মধ্যবিত্ত এবং সর্বহারাদের জীবনকাহিনীকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি ছোটগল্পের উল্লেখ করতে পারি যেমন- 'ফসিল' , 'পরশুরামের কুঠার' , 'গোত্রান্তর' , 'অযান্ত্রিক' ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের(১৯১৬-১৯৭৫) আবির্ভাবও এই সময়। প্রথমদিকে কবিতা লিখলেও পরবর্তীকালে গল্প-উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন 'অসমতল' । মধ্যবিত্ত মানুষের অন্যায় ও অবক্ষয়কে তিনি সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। তিনি তাঁর গল্প সম্বন্ধে বলেছেন-

".....নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারাজীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি।"

মন্বন্তর সম্পর্কিত গল্পগুলি কিন্তু কেবলই অন্নহীনতার বা দারিদ্রের কাহিনী নয়। আসলে সেগুলি অত্যাচারেরই ইতিহাস। বাংলা সাহিত্যে এই সার্বিক অত্যাচার-চেতনা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী উদ্দীপনারই প্রান্তিক ফল বলা যেতে পারে। ১৯৪৪ সালে পরিমল গোস্বামী 'মহামন্বন্তর' নামে একটি গল্প সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু এই গল্পসংকলনের রচনাগুলিও মন্বন্তর-বিষয়ক গল্পের বহুমাত্রিক চরিত্রটিকে প্রকাশ করেছে।

মন্বন্তর ও যুদ্ধশেষে ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটলেও সর্বনাশের শেষ হল না। মন্বন্তর যে অবক্ষয়ী মানবতার সূচনা করল তার আর এক বিধ্বংসী ও লজ্জাদায়ক রূপ দেখা দিল দাঙ্গা ও দেশবিভাগের আতঙ্ক রূপে। মন্বন্তরের সর্বরিক্ততার পরে আমাদের জাতির জীবনে চরম লাঞ্ছনার 'কালা দিবস' নিয়ে এল ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগাস্ট কলকাতার বুকে মুসলমানের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং ১৬ই অক্টোবর নোয়াখালীতে হিন্দুনিধন যজ্ঞ। এ বিষয়ে সমকালীন একটি বিবৃতি প্রণিধান যোগ্য-

"British imperialism encouraged, fostered and developed feudalism, communalism and used them as its political allies."

সাম্প্রদায়িক সঙ্কট এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাব নিয়ে লেখা গল্পের ধারা জোরালো হতে থাকে ১৯৪৬-এ দুটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান তিক্ত সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে। বহু সমুজ্জ্বল ছোটগল্প লেখা হয়েছে এই ধারায়। এই ধারার গল্পের মধ্যে সমরেশ বসুর 'আদাব' প্রকাশ পায় ১৯৪৬-এ এবং রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া' ১৯৪৭-এ। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে বাংলা ছোটগল্পে বাস্তববোধ, প্রগতি-চেতনা, সমাজ-মনস্কতা এবং প্রতিবাদী চেতনার অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়-পর্বে 'পরিচয়' , 'অরণি' , 'ক্রান্তি' (সংকলন), 'প্রতিরোধ' ইত্যাদি পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই সেই প্রতিবাদী ও প্রগতি মনস্ক গল্প প্রকাশের ক্ষেত্র ছিল। এই সময়কার গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গপাধ্যায়(১৯১৮-১৯৭০)। চল্লিশের দশকে তিনি নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ এদের সাথে সমানতালে গল্প লিখেছেন। সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে লিখেছেন-

"একদিকে সমাজবাস্তবতার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত এবং তার জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ, অন্যদিকে শোষক পীড়কদের তীব্র ঘৃণা এই গল্পগুলির একটা তীক্ষ্ণ বৈশিষ্ট্য।"

এছাড়া যাঁদের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি অথচ চল্লিশের দশকে এই ধারার গল্পে যারা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অবন্তীকুমার সান্যাল ও শান্তি দেবীর(সংকলন বহুকাল পরে প্রকাশিত) নাম উল্লেখযোগ্য। আরও দুই নারী-লেখক ছিলেন সুলেখা সান্যাল ও সাবিত্রী রায়। সুলেখা সান্যালের গল্পগ্রন্থ 'সিঁদুরে মেঘ' -এর প্রকাশ চল্লিশের দশকে, সাবিত্রী রায়ের গল্পসংকলন প্রকাশ পায় পঞ্চাশের দশকের প্রথমে। ১৯৪৫ সালের প্রথমেই একটি প্রবন্ধে বাংলা কথাসাহিত্য সম্পর্কে যে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন চিন্মোহন সেহানবিশ তা উদ্ধৃত করা যায় এখানে-

"আমাদের বাংলা কথাসাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে কিছুদিন হল এখানেও লেখকেরা বস্তুনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছেন। এর সঙ্গে ইংল্যান্ডের সাম্প্রতিক New Writing, Documentary Film ও Mass observation ধারার তুলনা খানিকটা চলতে পারে। বাংলা সাহিত্যে এইধারা বহু খ্যাত-অখ্যাত সাহিত্যিকের দুর্ভিক্ষ বা অন্যান্য সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখবার চেষ্টার মধ্যে পরিস্ফুট। এর মূল্য কম নয়। দৃষ্টির সজীব আন্তরিকতা, কথোপকথনের স্বাভাবিকতা ও আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে একাগ্র উৎসাহ-এ সবই হল এ ধরণের রচনা।"

ফ্যাসিস্ট-বিরুদ্ধ মনোভাবের সম্পদ, অন্যায়ের ও অত্যাচারের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা। এই উদ্দীপনা বাংলায় দাবানল আকারে ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে স্থানে স্থানে তেভাগার লড়াইয়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৪০-৫০ এই দশ বছরের পালাবদলের পালায় বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার সব লক্ষণগুলিই ধরা পড়েছে একালের ছোটগল্পগুলিতে। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও উদ্বাস্তু স্রোতের ধাক্কায় পূর্বনির্ধারিত ধারা পরিবর্তিত হয়ে বাংলার সমাজজীবন ধাবিত হয়েছে নতুন খাতে। সেই পরিবর্তিত ধারায় শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, মূল্যবোধের বিনষ্টি, শান্তি, স্থিতি, নিশ্চয়তার অবসান, সমাজ-আশ্রিত জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ব চেতনা সবদিক দিয়েই নিত্যনতুন পরীক্ষার মধ্যদিয়ে এগিয়ে গেছে একালের ছোটগল্প। সমকালীন অবক্ষয়, হতাশা ও ভয়ংকর সব ঘটনার তথ্যবহুল দলিল হয়েও গল্পগুলি শিল্পরীতিহীন হয়ে যায়নি। সমকালীন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাঋদ্ধ অথচ মানবরসে জারিত এই ছোটগল্পগুলির পরিবর্তিত অগ্রগতির পথেই সার্থকভাবে সুস্পষ্ট হয়েছে নতুন প্রজন্মের উত্তরপুরুষের পদচিহ্ন।

গ্রন্থনির্দেশ :

১) ছোটগল্পের বিচিত্র কথা : ডঃ সরোজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২) পঞ্চাশের মন্বন্তর : শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

৩) বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস : শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য।

৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প : ডঃ ভাস্বতী চক্রবর্তী।

৫) ছোটগল্পের বিশয়-আশয় : সুমিতা চক্রবর্তী।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১) ডঃ ব্রততী চক্রবর্তী (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)।

২) ডঃ সুমিতা চট্টোপাধ্যায় (ঐ)।

৩) শ্রীসুদিন চট্টোপাধ্যায় (প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ)।

৪) ডঃ শতঞ্জীব রাহা (কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়)।